প্রচ্ছদ প্রতিবেদন

গ্লোবাল ডাটা ডিভাইড ও করোনাভাইরাস

গোলাপ মুনীর

করোনা মহামারী থেকে বিজয়ী যারা, তাদের সংখ্যা খুবই কম। তবে নিজেদের মধ্যে ডিজিটালায়নের মাধ্যমে উপকারভোগী হতে পেরেছে অনেকেই। কারণ করোনাভাইরাস ডিজিটালায়নকে আরো ত্বরান্বিত করছে। বহুজাতিক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রত্যাশা অ্যানালগ ভ্যালু চেইনের বর্তমান বাধাগুলো ডিজিটাল বাণিজ্যকে আরো জোরালো করে তুলবে। অপটিমাইজেশন সফটওয়্যার কোম্পানি Route4Me মনে করে, অধিকতর ডিজিটালায়িত সাপ্লাই চেইন ই-কমার্সকে একটি নর্ম বা নিয়মাচারে পরিণত করতে পারত।

এমনকি এই কভিড-১৯ মহামারীর প্রাদুর্ভাবের আগেও 'গ্লোবাল সাউথ'-এর প্রত্যাশা কেন্দ্রীভূত ছিল ডিজিটাল বাণিজ্য ও ডিজিটাল ইকোনমির মাঝে। প্রযুক্তি কোম্পানি ও মূল উন্নয়ন করপোরেশনগুলো এ কথা স্বীকার করে– নয়া ডিজিটাল মার্কেটগুলো সংশ্লিষ্ট রয়েছে উচ্চতর প্রবৃদ্ধি হার ও বড় ধরনের সমৃদ্ধির সাথে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য– 'গ্লোবাল সাউথ' ও 'গ্লোবাল নর্থ' হচ্ছে এই পৃথিবীকে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বিবেচনায় বিভাজিত দুটি ভাগের নাম। এটি কোনো ভৌগোলিক বিভাজন নয়। গ্লোবাল নর্থে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়নের সব রাষ্ট্র, রাশিয়া, ইসরাইল, জাপান, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড। অপরদিকে গ্লোবাল সাউথে রয়েছে আফ্রিকা, লাতিন আমেরিকা, মধ্যপ্রাচ্যসহ উন্নয়নশীল এশিয়া, রাশিয়া ছাড়া ব্রিকভুক্ত অন্যান্য দেশ, যেমন ব্রাজিল, ভারত, চীন ও ইন্দোনিশিয়া।

১৯৯০-এর দশকের মাঝামাঝির সূচনা সময় থেকে ডিজিটাল বাণিজ্য বরাবর ছিল প্রচলিত বাণিজ্যের চেয়ে অধিকতর গতিশীল ও উদ্ভাবনীমূলক। ইলেকট্রনিক কমার্স অনেক বেশি গতি নিয়ে বিকশিত হয়ে আসছিল। যখন বিশ্ববাণিজ্য বর্তমানে বাড়ছে ৩ শতাংশের চেয়েও কম হারে, তখন ই-কমার্স বাড়ছে দুই অঙ্কের বেশি হারে। আঙ্কটাডের (ইউনাইটেড ন্যাশনস কনফারেন্স অন ট্রেড অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট) মতে– বিশ্বে বছরে অনলাইন বাণিজ্যের পরিমাণ ২৯ ট্রিলিয়ন (১ ট্রিলিয়ন = ১০১২) ডলারের মতো।

ডিজিটাল বাণিজ্যে মুনাফা

তা সত্ত্বেও মাত্র দুটি দেশ মুনাফা করে আসছে অনলাইন বাণিজ্যের অগ্রগতি থেকে। দেশ দুটি হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র ও চীন। বিশ্বের সবচেয়ে বড় ৭০টি প্ল্যাটফরমের ৯০ শতাংশ বাজারমূল্য এই দেশ দুটির দখলে। ইউরোপের অবদান মাত্র ৩.৬ শতাংশ। উন্নয়নশীল ও বিকাশমান দেশগুলোর দেখাবার মতো কিছুই নেই। চীন বাদে এশিয়ার এই বাজারে অবদান ৫ শতাংশ, আফ্রিকা ১.৩ শতাংশ, লাতিন আমেরিকা মাত্র ০.১ শতাংশ, যদিও এই মহাদেশে রয়েছে বিশ্বের প্রধান ২০টি দেশের ৩টি : আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল ও মেক্সিকো। এই আঞ্চলিক বৈষম্য আরো খারাপের দিকে

যেতে পারে। কারণ কভিড-১৯ বড় করপোরেশনগুলোর জন্য ডিজিটাল ইকোনমিতে বিনিয়োগের কারণ সৃষ্টি করেছে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক ট্রান্সন্যাশনাল কোম্পানিগুলো এরই মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্ভাব্য কোনো ভাইরাস মহামারী মোকাবিলায় আরো উন্নততর প্রস্তুতি হিসেবে তাদের গ্লোবাল ভ্যালু চেইন ডিজিটালায়নের পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে।

ডিজিটাল বাণিজ্য সূচনার পর এরই মধ্যে এটি শুধু বড় ধরনের এক বিষয়েই পরিণত হয়নি, এটি বাণিজ্যে মৌলিক পরিবর্তন এনেছে। এর ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক গুরুত্ব ডাটা বিনিময়সহ ডিজিটাল কমার্স-সংক্রান্ত বাণিজ্য চুক্তিতে প্রতিফলিত হচ্ছে। ডব্লিউটিও'র (ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন) একটি মুখ্য চুক্তি হচ্ছে ১৯৯৭ সালের ইনফরমেশন টেকনোলজি অ্যাগ্রিমেন্ট (আইটিএ)। এই চুক্তি হচ্ছে ল্যাপটপ থেকে শুরু করে সেলফোন পর্যন্ত যাবতীয় তথ্যপ্রযুক্তি-পণ্যের ওপর থেকে আমদানি শুল্কের অবসান ঘটানো। আইটিএ চুক্তিতে যদিও এ পর্যন্ত ৮১টি দেশ যোগ দিয়েছে, তবু এর নেতিবাচক পরিণতির উদাহরণ হয়ে আছে ভারত। ট্যারিফের সমাপ্তির পর বহুজাতিক টেলিযোগাযোগ ও কনজ্যুমার ইলেকট্রনিকস করপোরেশনগুলো বিপুল পরিমাণ চীনা পণ্য আমদানির বন্যা বইয়ে দেয়। তা বিধ্বস্ত করে দেয় ভারতীয় বৃহদাকার উৎপাদনকারী ও সরবরাহকারীদের। ভারতের চলতি বাণিজ্য ঘাটতির জন্য অংশত এ বিষয়টি দায়ী। বিশেষ করে স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে– যেসব দেশের বাজেট প্রধানত ট্যারিফ ইনকামের ওপর নির্ভরশীল– সেগুলো বিপুল পরিমাণ রাজস্ব হারায়। টগো, বেনিন, সিয়েরা লিওন ও মালির আমদানি শুল্ক থেকে আয় মোট রাজস্ব আয়ের ৪০ শতাংশ কমে যায়।

ডব্লিউটিও'র বৈষম্য

উন্নয়নশীল দেশগুলোর একটি অনুল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে বই, ভিডিও গেম, ফিল্ম, মিউজিক ও সফটওয়্যারের মতো ইনটেনজিবল পণ্যের (স্পর্শ ধারা বোধগম্য নয়, এমন পণ্য) বাণিজ্যে। গ্লোবাল সাউথের একটি দেশকেও পাওয়া যাবে না দশটি ইলেকট্রনিকভাবে হস্তান্তরযোগ্য পণ্যের বাজারের বিশ্বসেরা দশটি দেশের একটি হিসেবে। ইনটেনজিবল পণ্যের আন্তঃসীমান্ত বাণিজ্যে এক নম্বর দেশ হচ্ছে চীন, যার এই বাণিজ্যের পরিমাণ ১৩০০ কোটি মার্কিন ডলার। জার্মানি ও যুক্তরাষ্ট্র এ ক্ষেত্রে চীনের তুলনায় অনেক পেছনে। এ ক্ষেত্রে জার্মানি ও যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যের পরিমাণ যথাক্রমে ৮০০ কোটি মার্কিন ডলার ও ৬০০ কোটি মার্কিন ডলার।

আর্থিক বিবেচনায়ও এই প্রান্তিকীকরণ দৃশ্যমান। আঙ্কটাডের এক সমীক্ষায় জানা যায়, ২০১৫ সালে ইনটেনজিবল পণ্যের বিশ্ববাণিজ্যের পরিমাণ ছিল ৬৩০০ কোটি ডলার। চীন ইনটেনজিবল পণ্য বাণিজ্যে অর্জন করেছে উল্লেখযোগ্য উদ্বৃত্ত বাণিজ্য। কিন্তু অনেক উন্নয়নশীল ও বিকাশমান অর্থনীতির দেশ ডিজিটালি ট্রান্সমিটেড পণ্যের আমদানিকারক নয়। কিছু কিছু দেশের রয়েছে উচ্চহারের বাণিজ্য-ঘাটতি। যেসব বিকাশমান দেশ নেট আমদানিকারক, সেগুলোর মধ্যে আছে মেক্সিকো। দেশটির বাণিজ্য-ঘাটতির পরিমাণ ৬০ কোটি ডলার। থাইল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, চিলি ও ব্রাজিল– এই প্রতিটি দেশের ২০ কোটি ডলারের বেশি করে বাণিজ্য-ঘটতি রয়েছে।

বিগত ২০ বছরে দেখা গেছে– বাণিজ্য সম্পর্ক সব সময় উদার করা হয়েছে স্বল্পোন্নত দেশ ও অঞ্চলকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। এই পর্যন্ত আইএটিএ ছিল ই-কমার্স ট্যারিফের ওপর একটি সাময়িক মরেটরিয়াম বা বিলম্বকরণ। এই মরেটরিয়াম বাড়ানোর ব্যাপারে সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে ডব্লিউটিওর মন্ত্রীপর্যায়ের বৈঠকে তা মেনে নিতে হয়। কিছুটা সময়ের জন্য বড় বড় আইটি করপোরেশনের শিল্পায়িত দেশগুলো চাপ সৃষ্টি করে আসছে ট্যারিফ মরেটরিয়ামকে স্থায়ী এবং সুযোগের দিক থেকে অসীম করে তুলতে। তা সত্ত্বেও উন্নয়নশীল দেশগুলো মনে করে– সম্পূর্ণ ট্যারিফ তুলে দেয়া হলে তা তাদের নিজস্ব স্থানীয় বাজারকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। আফ্রিকার শিল্প কোম্পানিগুলো তাদের পণ্যের বেশিরভাগ বিক্রির জন্য নির্ভরশীল আঞ্চলিক বাজারের ওপর। আফ্রিকাকে একটি মুক্তবাণিজ্য অঞ্চল হিসেবে গড়ে তোলার পেছনে মুখ্য উদ্বুদ্ধকরণ হচ্ছে, একটি নিরাপদ বিক্রয়-চ্যানেল সৃষ্টি। এই কাজটি ঝুঁকির মধ্যে পড়তে পারে ইলেকট্রনিক্যালি ট্রেডিং ডিজিটাল পণ্যের অপর্যাপ্ত বাণিজ্যিক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে।

ডাটার মালিক কে?

তা সত্ত্বেও ডব্লিউটিও একমাত্র সংস্থা নয়, যা ডিজিটাল ডাটা বিদ্ধিভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে। ২০০০ সাল থেকে স্থিতিশীলভাবে এ সম্পর্কিত দ্বিপাক্ষিক চুক্তির সংখ্যা বেড়ে চলেছে। এর প্রায় ২০টি চুক্তিতে রয়েছে স্থানীয় চাহিদা নিষিদ্ধ করার মতো বিতর্কিত বিধিবিধান। এর অর্থ, লোকাল সার্ভারে ডাটা মজুদ ও প্রক্রিয়াজাত করার জন্য এসব দেশের ট্রান্সন্যাশনাল কোম্পানি প্রয়োজন নাও হতে পারে।

অনেক উন্নয়নশীল দেশ আমদানি শুল্ক স্থায়ীভাবে বাতিল করার বিরোধিতা সত্ত্বেও বিগত দুই বছর ধরে শীর্ষস্থানীয় শিল্পায়িত দেশগুলো ব্যাপক প্রচারণা চালাচ্ছে স্থায়ীভাবে আমদানি শুল্ক বাতিল করে একটি ডব্লিউটিও চুক্তি স্বাক্ষর করতে। ইইউ, ইউএস, জাপান, এমনকি চীনসহ কিছু বিকাশমান দেশ যোগ দিয়েছে ফ্রেন্ডস অব ই-কমার্স ফর ডেভেলপমেন্টে (এফইডি)। এরা চাইছে– এ ধরনের নিষিদ্ধকরণ ও উদারীকরণের ব্যাপারে সমঝোতা করায় ডব্লিউটিও থেকে একটি ম্যান্ডেট পেতে। করোনাভাইরাসের কারণে ডিজিটাল ইকোনমির অনুমিত সম্প্রসারণের আলোকে এফইডি এখন আরো জোরালো দাবি তুলেছে : বাণিজ্যিক চুক্তিগুলোতে ই-কমার্সকে আরো অধিক উদারীকরণ করতে হবে।

বিগত ২০ বছরে দেখা গেছে, বাণিজ্যিক সম্পর্ক সব সময়ই উদারীকরণ করা হয় স্বল্পোন্নত দেশ ও অঞ্চলগুলোর ক্ষতিসাধন করে। অতএব, আঙ্কটাড সতর্কবার্তা দিচ্ছে দ্রুত ডিজিটাল ট্রেড উদারীকরণের বিধি প্রণয়নের জন্য। বিশেষ করে এই সতর্কবার্তাটি দেয়া হচ্ছে এই করোনা মহামারীর সঙ্কটের সময়ে। ভার্চুয়াল স্পেসে কোনো সিদ্ধান্ত নেয়াটা উচিত হবে না। কারণ, এফইডি এখন বলছে– অনেক উন্নয়নশীল দেশ ডিজিটাল ডিভাইডের কারণে এখনই অনলাইন নিগোসিয়েশনে অংশ নিতে পারবে না এবং কভিড-১৯-এর কারণে তাদের সব রাষ্ট্রীয় সম্পদও জনস্বাস্থ্যে ব্যয় করতে পারবে না।

তা সত্ত্বেও গ্লোবাল সাউথের ভবিষ্যৎ ডিজিটাল ইকোনমি শুধু বাণিজ্যিক চুক্তিগুলো দিয়েই রূপায়িত হয় না। অধিকতর হারে ইকোনমি হয়ে উঠছে ডাটা ইকোনমি। প্রশ্ন হচ্ছে : ডাটা রয়েছে কার কাছে? ডাটার মালিক কে? সে প্রশ্নটিই এখন গুরুত্বপূর্ণ। কারা সার্ভার ডাটা মজুদ করে? কাকে অনুমোদন দেয়া হয় ডাটা বিশ্লেষণের এবং তাকে কে রূপান্তর করে নগদ অর্থে?

ইইউ'র অসমনীতি

আন্তর্জাতিক সাময়িকী দ্য ইকোনমিস্ট যথার্থই বলেছে : 'ডাটা ইজ দ্য নিউ ওয়েল'। একটি ডাটা অর্থনীতিতে কাঠামো ও কাঠামোগত নির্ভরতা 'এক্সট্রাকটিভ র' ম্যাটেরিয়ালে'র নির্ভরতার মতোই। উভয় ক্ষেত্রে কাঁচামালের সংগ্রহ থেকে সংশ্লিষ্ট দেশগুলো উপকৃত হয় না। বরং উপকৃত হয় সেইসব দেশ, যেগুলো এই কাঁচামাল প্রক্রিয়াজাত করতে পারে। ডাটা ইকোনমি অবকাঠামোতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে : সাবমেরিন ক্যাবল, নেটওয়ার্ক নোডস, ডাটা, ডাটা সেন্টার, অ্যালগরিদম ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা। আজ পর্যন্ত নিজের ও তাদের দেশের নাগরিকদের স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ইইউ প্রয়োগ করেছে অসমনীতি। বাকি দুনিয়ার ক্ষেত্রেও ইইউ একই অসমনীতি প্রয়াগ করেছে।

উন্নয়নশীল ও বিকাশমান দেশগুলোকেঅবশ্যই সহায়তা করতে হবে তাদের নিজেদের সরকারি ডাটা অবকাঠামো গড়ে তুলতে, যাতে তাদেরকে আর ট্রান্সন্যাশনাল ইনফরমেশন ও কমিউনিকেশন টেকনোলজি কোম্পানিগুলোর মালিকানাধীন অবকাঠামোর ওপর নির্ভর করতে না হয়। আন্তর্জাতিক সমাজকে অবশ্যই এ ক্ষেত্রে সহায়তা করতে হবে উন্নয়নশীল ও বিকাশমান দেশগুলোকে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, শিল্পায়িত দেশগুলোকে এসব দেশকে দিতে হবে প্রয়োজনীয় রিসোর্স– আর্থিক সহায়তা থেকে শুরু করে জ্ঞান ও প্রযুক্তি হস্তান্তরের মাধ্যম।

ভৌত ও টেনজিবল পণ্য হস্তান্তর এবং মনোপলি নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা করার জন্য একটি যথাযথ কাঠামো ছাড়া গ্লোবাল সাউথ অর্থনৈতিকভাবে অংশ নিতে পারে না। ইইউ বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে এবং প্রস্তাব উপস্থাপন করেছে বাজারে যুক্তরাষ্ট্রের ও এশিয়ার প্রাধান্য সৃষ্টিতে বাধাগ্রস্ত করতে : অ্যান্টিট্রাস্ট আইন লঙ্ঘনের কারণে কোটি কোটি ডলার জরিমানা থেকে শুরু করে ডিজিটাল ট্যাক্স আরোপ ও করপোরেশন ভাঙার ব্যাপারে বিতর্কের সূচনা করা হয়েছে। সম্প্রতি গঠিত ইউরোপীয় কমিশন অগ্রাধিকার দিচ্ছে ইউরোপের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা জোরালো করে একটি ডিজিটাল স্ট্র্যাটেজি গড়ে তোলার ব্যাপারে। পূর্ববর্তী কমিশনের ২০১৮ সালের যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত সৃষ্টি করে 'জেনারেল ডাটা প্রটেকশন রেগুলেশন' (জিপিডিআর), যেটি ভবিষ্যৎ প্রতিটি বাণিজ্য ও বিনিয়োগ চুক্তির জন্য আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক এক উপাদান। তা সত্ত্বেও এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়ে ইউরোপীয় বাণিজ্যনীতিতে অব্যাহতভাবে চাপ দেয়া হয় বিনিয়ন্ত্রণের ওপর। এমনকি এই কমিশন সমালোচনা করেছিল ভারতের পার্সোনাল ডাটার কমপক্ষে একটি কপি ভারতীয় সার্ভারে রাখার নীতির। কমিশন বলেছিল, এটি 'আননেসেসারি' এবং 'পটেনশিয়্যালি হার্মফুল'।

আজ পর্যন্ত ইইউ অসমনীতি প্রয়োগ করে আসছে নিজের ও এর নাগরিকদের স্বার্থ হাসিল করার জন্য। ডাটা প্রটেকশনকে দেখা হয় ইউরোপকে সুরক্ষা দেয়ার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে। এর পরও এটি অন্যান্য দেশে ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর কর্মকাণ্ডের জন্য একটি বাধা। ইইউর শুধু একটি 'কমিউনিটি অব ভ্যালুজ', অর্থাৎ একটি মূল্যবোধসম্পন্ন সমাজ হিসেবেই পরিচিত হওয়া উচিত। কজ